গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১১ সংখ্যা (ডিজিটাল) www.ganadabi.com ২৭ নভেম্বর ২০২০ পৃ. ১

২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের দিন মহানগরীর প্রাণকেন্দ্র এসপ্ল্যানেডে বিক্ষোভ। পুলিশ ১০৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। আহত ১৫। (ডানদিকে) কোচবিহারে জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভকারীদের গ্রেপ্তার করছে পুলিশ

সর্বাত্মক ধর্মঘটে অচল গোটা দেশ

সংগ্রাম জারি রাখার শপথে সোচ্চার মেহনতি মানুষ

২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের সাফল্যে কমরেড প্রভাস ঘোষের অভিনন্দন

আজ ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে জীবন-জীবিকার জরুরি সাত দফা দাবিতে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটকে যেভাবে শ্রমিক কৃষক ছাত্র যুব মহিলা সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ আবেগের সাথে সফল করেছেন সেজন্য তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি বিবৃতিতে বলেন, এই সর্বাত্মক সফল ধর্মঘটে জনগণের মনের পুঞ্জীভূত রোষ প্রতিফলিত হওয়ার সাথে সাথে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার সম্পর্কে চূড়ান্ত অনাস্থাই প্রকাশ পেয়েছে।

সারা ভারতের কৃষক সংগঠনগুলির দিল্লি অভিযান ব্যর্থ করার জন্য কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে যেভাবে পুলিশি নির্যাতন চালিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। আজ ধর্মঘটের প্রচার করার সময় আমাদের দল ও অন্যান্য সংগঠনের শত শত কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমরা তাঁদের অবিলম্বে মুক্তি দাবি করছি। আজকের সফল ধর্মঘট সুস্পষ্ট করে দিল যে, সরকার যদি অবিলম্বে এই ন্যায্য দাবিগুলি মেনে না নেয়, তবে জনগণ দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বে। জনগণের প্রতি আমাদের আহ্বান, শ্রমিক-কৃষক ও জনগণের ঐক্য সুদৃঢ় রেখে আপনারা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে এগিয়ে চলুন।

২৬ নভেম্বর সন্ধ্যার পর গুটিকয় বাস আর ট্যাক্সি সারা দিন পর নেমেছে কলকাতার রাস্তায়। এ দিন দেশ জুড়ে খেটেখাওয়া মানুষ পালন করেছেন ধর্মঘট। কথা হচ্ছিল ওয়েলিংটন মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা ট্যাক্সি চালক পুষ্পেন্দ্র কুমারের সাথে। কেমন হল ধর্মঘট? জিজ্ঞাসা করতেই বলতে শুরু করলেন, 'এ হরতাল হোনা চাহিয়ে থা'। তীব্র ভাষায় উগরে দিলেন ক্ষোভ। এই মোদি সরকার আমাদের সকলের রোজগার কেড়ে নিয়েছে। একটু ডাল-ভাত- সবজি খাব সে উপায়ও নেই। সব দাম আকাশছোঁয়া। আমি আজ সারাদিন গাড়ি বার করিনি, এই এখন একটু বেরিয়ে দাঁড়িয়েছি, রাস্তাঘাট দেখতে। এখনই ফিরে যাব। দুপুরে একই সুর শোনা গিয়েছিল চাঁদনিচক, তালতলা বাজার, কোলে মার্কেটের মুটিয়া মজদুর, হকার, ভ্যানচালকদের থেকে। এক দিনের রোজগার হারাতে ক্ষোভ নেই তাঁদের? প্রায় এক সুরে তাঁরা জবাব দিয়েছে, পুরো রোজগারটাই তো কেড়ে নিচ্ছে সরকার। এই একটা দিনের লোভ দেখিয়ে লড়াইকে দুর্বল করবে ওরা? তা হতে দেব না।

দেশ জুড়ে সর্বাত্মক স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল সারা দেশের উৎপাদনের চাকা। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা জুড়ে খেটে-খাওয়া মানুষ উৎপাদনের চাকাকে স্তব্ধ করে দিলেন। খনি, ব্যাঙ্ক, বিমা, ভারি শিল্প, পরিবহণ, অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রেই ধর্মঘটে সামিল হয়েছিলেন কোটি কোটি শ্রমিক। দেশের প্রায় সব রাজ্যেই আশা কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল প্রভৃতি স্কিম ওয়ার্কাররা সমস্ত হুমকি অস্বীকার করে ধর্মঘট পালন করেছেন। সারা দেশের শ্রমজীবী মানুষ সোচ্চার কণ্ঠে একচেটিয়া মালিকদের পদলেহী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়ে দিলেন, এই সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে আমাদের শ্রমের ওপর ভর করে। মালিকের মুনাফার স্বার্থে আমাদের জীবনের ওপর একের পর এক নৃশংস আঘাত আমরা মেনে নেব না।

এ আই ইউ টি ইউ সি সহ ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকা সারা ভারত ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিল এস ইউ সি আই (সি)। এস ইউ সি আই (সি) দল এবং তার গণসংগঠনগুলি সক্রিয়ভাবে নেমেছিল ধর্মঘটের প্রচারে। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চালিয়েছে নিবিড় প্রচার। গ্রামে শহরে গঞ্জে, কারখানার গেটে হয়েছে অসংখ্য ছোট ছোট সভা। ২৬ নভেম্বর তাঁরা শ্রমিক কর্মচারীদের সাথেই সংগঠিত করেছেন পিকেটিং, রাস্তা অবরোধ, রেল রোকো। পশ্চিমবঙ্গে পিকেটিং এবং অবরোধ করতে গিয়ে ২০৫ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশের আক্রমণে আহত ৩৬ জন। বিজেপি শাসিত আসামের শিলচরে ধর্মঘট করতে গিয়ে ২ হাজার বনধ সমর্থক গ্রেপ্তার হয়েছেন। ত্রিপুরায় ধর্মঘট এতটাই গভীর প্রভাব ফেলেছে যে ক্ষিপ্ত বিজেপি দুষ্কৃতীরা আগরতলার এস ইউ সি আই (সি) অফিসে হামলা চালিয়েছে। হামলায় আহত হয়েছেন দুজন পার্টি কর্মী। সিটু এবং সিপিআই অফিসেও তারা হামলা করেছে। দিল্লিতে ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল করতেই বাধা দেয় পুলিশ। দীর্ঘক্ষণ রেল আটকে থেকেছে, রাস্তা বন্ধ হয়েছে। ধর্মঘটের প্রতি তবু সমর্থন জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। কারণ তাঁরা মনে করেছেন পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায়, ঘুরে দাঁড়াতে হলে প্রতিপক্ষকে দিতে হয় তীব্র আঘাত, যে আঘাত হল সর্বাত্মক ঘর্মঘট।

কেন এই ধর্মঘট? করোনা অতিমারিতে বিপর্যস্ত দেশ। জীবিকা খুইয়েছেন কোটি কোটি মানুষ। ব্যবসাপত্রে নিদারুণ মন্দার ছায়া। বন্ধ অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা। রোগ সংক্রমণের হার কমার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দেশের মানুষের এই চরম দুঃসময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে পুঁজিপতি শ্রেণির ধূর্ত ও কৌশলী রাজনৈতিক ম্যানেজার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঠিক এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছে তাদের ওপর মূল্যবৃদ্ধি, ছাঁটাই, অতিরিক্ত কাজের বোঝা, রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বেসরকারিকরণের মতো জনস্বার্থবিরোধী কার্যক্রম চাপিয়ে দেওয়ার জন্য। পাশাপাশি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করে তুষ্ট করে চলেছে দেশের পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের। এই চরম জনবিরোধী সরকারের সর্বনাশা নীতিগুলির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া মেহনতি বাঁচার পথ কোথায়!

এই দুঃসময়ের সুযোগে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে বেসরকারি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার পুরনো ষড়যন্ত্র কার্যকর করছে। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, বিদ্যুৎ, তৈলক্ষেত্র, বিমান, খনি ইত্যাদি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে একে একে পুঁজিমালিকদের কাছে বেচে দেওয়ার কাজ শুরু করে দিয়েছে। মুনাফা-লুটেরা মালিকরা এবার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিকদের অর্জিত

আটের পাতায় দেখুন

কৃষক বিক্ষোভে উত্তাল রাজধানী

নানা রাজ্য থেকে আসা প্রায় দেড় লক্ষ কৃষকের পদধ্বনিতে কাঁপছে দিল্লি। হাজারো বাধায় তাদের দিল্লি অভিযান আটকাতে পারল না বিজেপি সরকার। ২২০টির বেশি কৃষক সংগঠনের যুক্ত মঞ্চ অল ইন্ডিয়া কিষান সংঘর্ষ কো-অর্ডিনেশন কমিটি (এআইকেএসসিসি)-র নেতৃত্বে জীবন বাজি রেখে দিল্লি এসেছেন তাঁরা দাবি আদায় করতে। বলছেন, 'চাহে কিতনা পানি ডালো, ইসসে যাদা তো হম পসিনা বহা চুকে'— যত খুশি ঢালো জলকামানের জল, তার চেয়ে ঢের বেশি ঝরিয়েছি আমাদের ঘাম! দাবি তুলেছেন, নতুন কৃষি আইন বাতিল করো, না হলে অচল করে দেব দেশের রাজধানী।

দিল্লির পথে এগিয়ে চলেছেন কৃষকরা

এআইকেএসসিসি, যার অন্যতম শরিক এআইকেকেএমএস ২৬ নভেম্বর ভারত বনধের অন্যতম অংশীদার ছিল। তারা আগেই ঘোষণা করেছিল ২৬ ও ২৭ নভেম্বর রাজধানী দিল্লিতে পার্লামেন্ট অভিযান করবে। এই গণতান্ত্রিক কর্মসূচিটুকুও করতে দিতে রাজি নয় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। দিল্লির সমস্ত প্রবেশপথগুলিতে ব্যারিকেড তৈরি করে কৃষকদের আটকে দেয় পুলিশ। বনধের আগের দিন ২৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয় কৃষক সংগঠনগুলির নেতাদের গ্রেপ্তারি। বাড়ি বাড়ি ঢুকে হামলা চালাতে থাকে পুলিশ। বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হল এআইকেকেএমএস নেতা হরিয়ানা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়করণকে। অন্যান্য সংগঠন মিলিয়ে শতাধিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সরকার ভেবেছিল, গ্রেপ্তারেই শেষ করে দেওয়া যাবে আন্দোলন। ভয় পেয়ে যাবেন কৃষকরা। কিন্তু না, সমস্ত ভয় ভীতি তুচ্ছ করে প্রায় দেড় লাখ চাষি দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বাসে, ট্রাক্টরে, পায়ে হেঁটে রওনা দিয়েছেন পার্লামেন্টের উদ্দেশে।

দিল্লির আগেই মিছিল রুখে দিতে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের পুলিশ পানিপথ ও সোনেপতের মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা কেটে দিয়েছে, গর্ত করে দিয়েছে, বহু জায়গায় বালির বস্তা দিয়ে, লোহার ব্যারিকেড দিয়ে পথ আটকে দিয়েছে। বহু ব্রিজের উপর ট্রাক-লরি আড়াআড়িভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। টিয়ারগ্যাস চার্জ করে, জলকামান ব্যবহার করে কৃষকদের দাবিকে স্তব্ধ করতে নেমেছে। উত্তরপ্রদেশ সরকার মধ্যপ্রদেশ সীমান্তে চাষিদের ৬৮ ঘণ্টা আটকে রাখে। দিল্লিতে ন'টি স্টেডিয়ামকে জেলখানা বানিয়ে তাতে কৃষকদের ঢোকানোর ঘৃণ্য চেষ্টা চালিয়েছে তারা। কিন্তু বিজেপি সরকারের সমস্ত বর্বরতা মোকাবিলা করেই কৃষকরা সামিল হয়েছেন দিল্লির বুকে অভিযানে। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষকদের মধ্যে দাঁড়িয়ে এআইকেকেএমএস-এর সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড সত্যবান ঘোষণা করেছেন, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের দিল্লি চলো ডাকে যেমন করে হাজার হাজার মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, সেভাবেই এই ডাকে সাড়া দিয়েছেন কৃষকরা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শংকর ঘোষ কৃষকদের এই দৃঢ়তার জন্য তাঁদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশ-রাজস্থান সীমান্তে হাইওয়ের উপর কৃষক-ধরনায় উপস্থিত অল ইন্ডিয়া কিষান খেতমজদুর সংগঠনের প্রতিনিধি কমরেড সুনীল গোপাল

মোদি সরকারের তিনটি কৃষি আইনে চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, ভোজ্যতেল, তৈলবীজ ইত্যাদিকে যত ইচ্ছে মজুতের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ও অত্যাবশ্যক তালিকা থেকে এগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মজুতদার কালোবাজারিরা চাষির কাছ থেকে সস্তায় কেনার পর এই সব জিনিসের দাম লাগামছাড়া বাড়াচ্ছে। কৃষিপণ্য কেনায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। চুক্তিচাষকে বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে সরকারের আর কৃষিপণ্য কেনার দায় থাকছে না। বাজার দখল করবে বৃহৎ পুঁজিপতিরা। ধূর্ত বিজেপি সরকার বলছে, এর ফলে চাষিরা ন্যায্য দাম পাবে। কিন্তু কৃষকরা জীবনের অভিজ্ঞতায় বোঝেন, এর ফলে বৃহৎ পুঁজির বৃহৎ শোষণের কবলেই তাঁদের পড়তে হবে। তাই কৃষকরা এত ক্ষুব্ধ। মোদি সরকার ন্যূনতম সহায়ক মূল্যও এর দ্বারা কার্যত তুলে দিল। ফলে কর্পোরেট মালিকদের দয়াতেই এবার বাঁচতে হবে চাষিকে।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী)-২০২০। এই আইন কার্যকর হলে বিদ্যুৎ আর পরিষেবা থাকবে না, হবে পণ্য। লাফিয়ে বাড়বে বিদ্যুতের দাম। সেচের খরচ বাড়বে। এমনিতেই কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পায় না। এই সব আক্রমণে চাষির পিঠ দেওয়ালে ঠেকছে। ফলে রুখে দাঁড়ানো ছাড়া আর পথ নেই। বাস্তবে সেটাই ঘটছে।

কৃষকরা জানে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক এবং স্বৈরাচারী এই বিজেপি সরকার সহজে কৃষকের দাবির কোনও মূল্য দেবে না। তাই দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের প্রস্তুতিই নিয়েছে কৃষকরা। লরি-ট্রাক্টরে খাদ্য সামগ্রী মজুত করেই তারা রওনা দিয়েছে। উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, রাজস্থান, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, কেরালা, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য থেকে হাজার হাজার কৃষকের স্রোত পুলিশি বাধা ভেঙে দিয়ে আছড়ে পড়েছে রাজধানীর বুকে।

মধ্যপ্রদেশে কৃষক বিক্ষোভে উপস্থিত মেধা পাটকর

দিল্লি অভিযানের ডাকে সাড়া দিয়ে হরিয়ানার মানসা জেলার কৃষক ধানা সিং রওনা দিয়েছিলেন। ভিওয়ানিতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। সংঘর্ষ কমিটির নেতৃবৃন্দ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, এই আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না। চাষিরা সদর্পে বলেছেন, সমাবেশ থেকে করোনা সংক্রমণের ভয় দেখিও না আমাদের। ধরে নাও সর্বনাশা কৃষি আইনের প্রতিবাদে এখানে আত্মহত্যাই করতে এসেছি আমরা।

আন্দোলনরত কৃষকদের উপর বিজেপি সরকারের পুলিশি আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন এসইউসিআই(সি) সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। তিনি এই বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সর্বত্র প্রতিবাদে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য রাজ্যের সর্বত্র প্রতিবাদ কর্মসূচি নেওয়ার বার্তা পাঠিয়েছেন।

হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রে কৃষকদের ওপর বিজেপি সরকারের জল কামান

সর্বাত্মক ধর্মঘটের জন্য জনগণকে অভিনন্দন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৬ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন,

বিজেপি সরকারের শ্রম আইন, কৃষি সংস্কার, জনবিরোধী শিক্ষানীতি সহ চূড়ান্ত জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি ২৬ নভেম্বর যে সারা ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল তাকে সর্বাত্মক সমর্থন করেছে আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটি। এই ধর্মঘটকে সারা দেশে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ, ছাত্র-যুব মহিলারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমর্থন করেছেন। আজ হরিয়ানার কৃষকরা যেভাবে পুলিশের জলকামান, বাধাকে উপেক্ষা করে দিল্লির অভিমুখে তাঁদের অভিযান অব্যাহত রেখেছেন, পাঞ্জাব সহ অন্যান্য রাজ্যের শ্রমিক-কৃষকরাও ধর্মঘটের পক্ষে যেভাবে লড়াইয়ের মানসিকতা দেখিয়েছেন তা খুবই অভিনন্দনযোগ্য। এই ধর্মঘটে পশ্চিমবঙ্গের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষও যে ভাবে সাড়া দিয়েছেন তার জন্য এ রাজ্যের জনগণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আজকের ধর্মঘটে ভারি শিল্প, কয়লাখনি, চটকল, চা বাগান শ্রমিকরা সহ অসংগঠিত ক্ষেত্রের বিপুল সংখ্যক কর্মী, আশা-আইসিডিএস সহ স্কিম ওয়ার্কাররা যেমন ব্যাপকভাবে সামিল হয়েছেন, একই ভাবে সামিল হয়েছে ভ্যান রিক্সা, মোটর ভ্যান, অটো, টোটো সহ পরিবহণ এবং রেল কর্মীরা। ছাত্র, যুব, মহিলারাও তাঁদের নিজস্ব দাবি নিয়ে সামিল হয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক, বিমা ক্ষেত্রে এই ধর্মঘটের প্রভাব ছিল সর্বাত্মক। হাওড়া এবং শিয়ালদহ শাখায় পিকেটিং-এর ফলে রেল চলাচলও ব্যাহত হয়েছে। কলকাতা সহ রাজ্যের সর্বত্র দোকানপাট ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ।

এস ইউ সি আই (সি) দল এবং তার গণসংগঠনের কর্মীরা এই ধর্মঘট সফল করার জন্য বিগত প্রায় একমাস ধরে প্রচার চালিয়েছেন। আজও তাঁরা নানা জায়গায় পিকেটিং করেন। কলকাতার এসপ্লানেড, কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে পুলিশ আমাদের কর্মীদের উপর লাঠিচার্জ করে। ধর্মঘটের প্রচার এবং পিকেটিং করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ২০৫ জন এস ইউ সি আই (সি) কর্মী গ্রেপ্তার হয়েছেন। পুলিশি আক্রমণে আহত হয়েছেন ৩৬ জন ।

এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিল বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারে তাদের বাধ্য করতে পারে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন। আরও দেখাল, নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন কোনও বিকল্প নয়। শক্তিশালী গণআন্দোলনই হল একমাত্র বিকল্প। এই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

২৬ নভেম্বর রাজ্য জুড়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘট

বাঁকুড়া

বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

জয়নগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

ফালাকাটা, আলিপুরদুয়ার

ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

পূর্ব মেদিনীপুর

বহড়ু, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

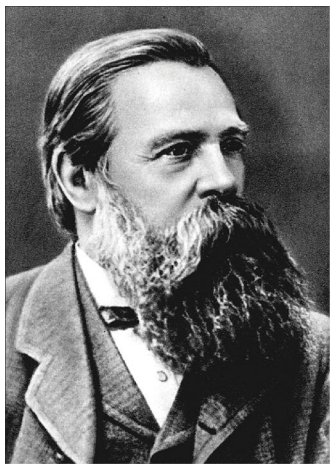

জন্ম ঃ ২৮ নভেম্বর, ১৮২০
মৃত্যু ঃ ৫ আগস্ট, ১৮৯৫

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ফ্রেডরিখ এঙ্গেলসের দ্বি-শত জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য

"একজন ব্যক্তি যখন এ কথা জেনেই অপরকে আঘাত করে যে, তার আঘাত মৃত্যুর কারণ হবে, তখন তার কাজকে আমরা বলি হত্যা। সমাজ যখন হাজার হাজার মানুষকে জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থেকে বঞ্চিত করে, বাঁচার অযোগ্য অবস্থার মধ্যে তাদের রেখে দেয়, আইনের বেড়ি পরিয়ে নিশ্চিত মৃত্যু পর্যন্ত ওই অবস্থায় থাকতেই বাধ্য করে, সহস্র জীবনের ধ্বংস অনিবার্য জেনেও সমাজ যখন ওই অবস্থাই চলতে দেয়, তখন একজন হত্যাকারীর মতোই সমাজের ওই কাজটিও মানবহত্যা ছাড়া কিছু নয়।"

(ইংল্যান্ডে শ্রমিক শ্রেণির অবস্থা, ১৮৫৪)

২৬ নভেম্বর দেশজুড়ে ধর্মঘটের দিন

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বরূপনগর, উত্তর ২৪ পরগণা

হাজরা, দক্ষিণ কলকাতা

বৃহৎ একচেটিয়া সংস্থাগুলিকে ব্যাঙ্ক খোলার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার দেওয়া অনুমতি প্রতিরোধ করুন

প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন, আম্বানি, টাটা, বিড়লা, মাহিন্দ্রাদের মতো বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলির 'অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং কর্মকুশলতাকে কাজে লাগানো'র অজুহাতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া তাদের ব্যাঙ্ক খোলার অনুমতি দিয়েছে। এই নীতি ব্যাঙ্কের সাধারণ গ্রাহক তথা দেশের জনসাধারণের জন্য অশুভ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। নিশ্চিত ভাবেই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের অনুমোদনে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। এতে শুধুমাত্র শাসক ধনকুবের গোষ্ঠীকেই শক্তিশালী করা হবে। বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থাগুলি যারা ব্যাঙ্ক থেকে ২০ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করেনি (এনপিএ), এর সুযোগে তারা নিজেদের নতুন ব্যাঙ্কে জনগণের জমা টাকা দিয়েই সেই ঋণ মেটাতে পারবে। এমনিতেই ব্যাঙ্কের বড়কর্তারা স্বীকার করেন যে, বৃহৎ কর্পোরেট গোষ্ঠীতে একবার টাকা ঢালার পর, সে টাকা কোথায় যায়, তার হিসাব মেলা কঠিন। বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলিতে একের পর এক কেলেঙ্কারি ঘটেই চলেছে। এমনকি এনপিএ-র কারণে হওয়া ক্ষতি পূরণ করতে গ্রাহকদের জমানো টাকা ব্যবহার করার এবং প্রস্তাবিত 'রেজলিউশন অথরিটি' ব্যবহার করে পিছনের দরজা দিয়ে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা চালু হতে চলেছে। জানা গেছে, সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে টাকা জমা রাখার শর্তগুলি পরিবর্তন করার, এমনকি বাতিল করার সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হবে এই রেজলিউশন অথরিটিকে।

১৯৬৯ সালে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সময় যুক্তি তোলা হয়েছিল যে, বেসরকারি ব্যাঙ্কগুলি তাদের সম্পদ ব্যক্তিমালিকদের স্বার্থে কাজে লাগায় এবং ফাটকাবাজ ও মজুতদারদের খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, এমনকি বেবিফুডের কালোবাজারি করার জন্য টাকা ধার দেয়। আজ সেই যুক্তি কি তার কার্যকারিতা হারিয়েছে? বর্তমানে বিশ্বায়নের নির্দেশ মেনে এবং বিপুল এনপিএ-র সংকট ঠেকিয়ে রাখতে, জনসাধারণের সম্পদ নয়ছয় করে তাদের বিপদগ্রস্ত করছে যে শাসক পুঁজিপতি শ্রেণি, তাদের স্বার্থ রক্ষায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ব্যাপক বেসরকারিকরণের পথে হাঁটছে।

আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করছি এবং এর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ জানানোর জন্য জনসাধারণের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি।

সারা দেশ জুড়ে ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

ব্যাপক পুলিশি সন্ত্রাস ও গ্রেফতার সত্ত্বেও শিলচরে ধর্মঘট সর্বাত্মক

কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ফেডারেশন এবং গণসংগঠনগুলির ভারত বনধের প্রভাব কাছাড় জেলার গ্রামাঞ্চলে ও জেলা সদর শিলচরে ছিল ব্যাপক। সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ২১ নভেম্বর শিলচরে এআইইউটিইউসি সহ বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের প্রায় দু'হাজার কর্মীর মিছিল শুরুর আগেই আটকে দিয়ে সবাইকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। সংগঠনগুলির যৌথ মঞ্চের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছে মাইক-প্রচারের অনুমতি চেয়েও পাওয়া যায়নি। ধর্মঘটের দিন সকাল থেকেই প্রচুর সংখ্যক পুলিশ ও আধা সামরিক বাহিনী বিভিন্ন স্থানে মোতায়েন করে বনধ সমর্থকদের গ্রেফতার করে। সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দলের উকিলপট্টির জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে জেলা সম্পাদক ভবতোষ চক্রবর্তী সহ অনেক কর্মীকে। শিলচর শহর ও জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) দলের কর্মী সমর্থক সহ প্রায় সাতশো বনধসমর্থনকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পুলিশি আতিশয্য ব্যাপক থাকলেও শিলচর শহর সহ জেলার প্রতিটি রাজপথ ছিল যানবাহন শূন্য। জেলার সরকারি ও বেসরকারি কার্যালয়ে ধর্মঘটের দিন কর্মচারীদের উপস্থিতির হার ছিল প্রায় শূন্য। জেলার কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও হাট-বাজার খুলেনি। জনগণের ব্যাপক সমর্থনে বনধ সফল হওয়ায় দলের পক্ষ থেকে জনসাধারণকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানানো হয়।

কর্ণাটকে ধর্মঘটের সমর্থনে রাজপথে প্রতিবাদী জনগণ

জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড

ত্রিপুরায় এস ইউ সি আই (সি) রাজ্য দফতরে বিজেপি দুষ্কৃতীদের হামলা

ত্রিপুরায় ধর্মঘটের সাফল্যে ক্ষিপ্ত হয়ে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য অফিস পুলিশের উপস্থিতিতে ভাঙচুর করে বিজেপির গুন্ডাবাহিনী

গোয়ালিয়র, মধ্যপ্রদেশ

আলাপ্পুজা, কেরালা

পাটনা, বিহার

দেশ জুড়ে ধর্মঘটে স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া

জশিপুর, ওড়িশা

मजफफरपुर, বিহার

যন্তর মন্তর, দিল্লি

অন্ধ্রপ্রদেশ

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ

ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

ডিন্ডিগুল, তামিলনাড়ু

বিহার নির্বাচন ঃ মোদী ম্যাজিক, না ধোঁকাবাজি?

সদ্য সমাপ্ত বিহার বিধানসভা নির্বাচনে হারতে হারতে খুব সামান্য ব্যবধানে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোট জয়ী হয়েছে।

কেমন সব জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন? এই নির্বাচনে জয়ী ৬৮ শতাংশ বিধায়কই মারাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত। তার মধ্যে আছে খুন, ধর্ষণের মতো অভিযোগ। বিজেপি, জেডিইউ, আরজেডি, কংগ্রেস, এমআইএম কেউই এ ব্যপারে কম যায়নি। কুখ্যাত মাফিয়া থেকে এলাকার বাহুবলী ডন, সব ধরনের দুষ্কৃতীই আছে এই তালিকায়। সিপিআইএমএল লিবারেশনের বিধায়কদের বিরুদ্ধেও মারাত্মক অপরাধের অভিযোগ আছে। দুষ্কৃতিরাজ এতটাই গভীর যে, যিনি শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধে এমন সব সমাজবিরোধী রেকর্ড আছে তা নিয়ে রাজ্যে হইচই পড়ে যায়। ফলে শপথ নেওয়ার তিনদিন পরেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

বিহারের মতো গরিব অধ্যুষিত রাজ্যে নির্বাচিত বিধায়কদের ৮১ শতাংশই বহু কোটি টাকার মালিক। দলগুলি এদেরই বেশি সংখ্যায় দাঁড় করিয়েছিল। টাকা, বাহুবল এবং প্রশাসনিক পক্ষপাতিত্ব যে কীভাবে নির্বাচনকে প্রভাবিত করে বিহার নির্বাচন তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ। এই বিধায়করা যে আইন করবেন তা কেমন গরিবের ভাল করতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। বিজেপি-জেডিইউ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ যে কতটা ক্ষোভে ফুটছে তা নির্বাচনের ফলেও বোঝা গেছে। বিজেপি জোট জিতেছে, কিন্তু তাদের অতিবড় সমর্থকও এই জয়কে জনগণের সমর্থন বলতে পারবেন না। কার্যত বিরোধীদের সাথে তাদের ভোট পার্থক্য নেই বললেই চলে। ভোট রাজনীতির কৌশলে তারা সরকারটা কোনও রকমে গড়তে পেরেছে এই মাত্র। একই সাথে ভাবা দরকার, এটাকেই যাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে জয় হিসাবে দেখাতে চাইছেন তাঁরাও বিকল্প কোন রাজনীতিটা মানুষকে দিলেন? আদৌ তাঁরা বিজেপির নীতি আদর্শের বিরুদ্ধে কোনও সঠিক রাজনীতি তুলে ধরতে পারলেন কি?

বিজেপি-জেডিইউ সরকারের অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ

নির্বাচনের আগে বিজেপি-জেডিইউ সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ যেন ফেটে পড়তে চেয়েছে। এই সরকারের আমলে বেকারি, দারিদ্র, কৃষকের দুর্দশা মারাত্মক আকার নিয়েছে। বিগত ১০ বছরে রাজ্যে কোনও নতুন কলকারখানা তৈরি হয়নি বললেই চলে। রাজ্যের লক্ষ লক্ষ যুবক পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হন। বন্যা, খরা প্রতিরোধে কোনও ব্যবস্থা তো অনেক পরের কথা, এর প্রকোপ থেকে মানুষের কষ্ট কমানোর ন্যূনতম প্রচেষ্টা নেই সরকারের।

নীতীশ কুমার ২০০৫ সালে সরকারে বসে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন 'করাপশন', 'ক্রাইম' এবং 'কমিউনালিজম'-এর অবসান করবেন তিনি। কিন্তু বাস্তবে বিহারে করাপশন অর্থাৎ দুর্নীতি ক্রমাগত বেড়েছে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতা তথা উপমুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রীর নামও জড়িয়েছে ৮৮০ কোটি টাকার 'সৃজন' কেলেঙ্কারির সাথে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের 'খাঁচার তোতা' সিবিআই-এর দয়ায় তাঁরা বুক ফুলিয়ে ঘুরছেন। মুজফফরপুর ছাত্রী হোমের কেলেঙ্কারিতে জেডিইউ-বিজেপি দলের তাবড় নেতারা যুক্ত। ইন্দিরা আবাস যোজনা কিংবা বার্ধক্য ভাতার মতো সরকারি প্রকল্পের ন্যায্য টাকা পেতে গেলে দরিদ্র মানুষও সরকারি দাদাদের নজরানা না দিয়ে কিছুই পান না। খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদি অপরাধ ভয়াবহ হারে বেড়েছে। জাতপাত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হানাহানি সারা দেশের মতো বিহারেও বেড়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিগত ৬ বছরে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের একের পর এক জনবিরোধী নীতির ধাক্কা। যার ফলে বিহারের মানুষের দুর্দশা আরও বেড়েছে। সম্প্রতি করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলার নামে অপরিকল্পিত লকডাউন সারা দেশের মতোই বিহারের মানুষের দুর্দশা সীমাহীন বাড়িয়েছে। বিহারের পরিযায়ী শ্রমিকদের ঘরে ফেরার রাস্তা বন্ধকরে বিহার সরকার চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে। কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের কৃষি ও শ্রম সংস্কার দারিদ্র পীড়িত বিহারের জনগণের কাছে এক বিরাট ধাক্কা। এই সমস্ত কিছুর জন্যই বিহার নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মধ্যে জেডিইউ-বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ ছিল।

'মোদী ম্যাজিক'!

মানুষের ক্ষোভ সত্ত্বেও বিজেপির এই জয় কি তাহলে মোদী ম্যাজিকে? বিহার ভোটের বাস্তব পরিসংখ্যান কি তাই বলছে? বাস্তব বলছে, ২১ খানা হেলিকপ্টার শত শত কোটি টাকা ঢেলেও বিজেপি একক ভাবে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের চেয়ে ১টি কম আসন পেয়েছে। বরং তাদের হাত ধরে নীতীশ কুমারের দলের প্রায় ভরাডুবি হয়েছে। বিজেপির নিজের তথা এনডিএ-র ভোট প্রাপ্তির শতাংশও কমেছে। গত বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় এবার বিজেপির ভোট কমেছে ৫ শতাংশের বেশি। এনডিএ এবং তার বিরোধী মহাজোটের মোট প্রাপ্ত ভোটের পার্থক্য মাত্র ১২ হাজার ২৭০, শতাংশের হিসাবে ০.০৩ মাত্র। বহু আসনে ১০০ থেকে ৫০০ ভোটের ব্যবধানে জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়েছে। এর জন্য প্রধানমন্ত্রী নিজে ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সহ বিজেপির একঝাঁক শীর্ষ নেতাকে প্রায় বিহারে পড়ে থাকতে হয়েছে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের পুরো মেশিনারিকে নিজেদের পক্ষে নামাতে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিজে হাত লাগাতে হয়েছে। মোদি ম্যাজিক তাহলে কোথায়?

তবে যে মোদি ম্যাজিক বলে একটা প্রচার চলছে, সেটা কোথায়? সেটা আছে, তবে মানুষের মনে নয়— আছে প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে ভোট মেশিনারি নিজের পক্ষে টানার কাজে, আছে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নামক বিষয়টিকে পুরো বিসর্জন দেওয়াতে পারার মুন্সিয়ানায়, আছে টাকার জোরে সমস্ত ধরনের প্রচারযন্ত্রকে কব্জা করায়। তিনি ম্যাজিক দেখিয়েছেন কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেসবুক ইত্যাদি সোস্যাল মিডিয়াতে 'ফেক নিউজ' ছড়ানোর কৌশলে। তাঁর ম্যাজিক থেকেছে মাসল পাওয়ার অর্থাৎ বাহুবলীদের এককাট্টা করে জনগণকে ত্রস্ত করে রাখায়। আর আছে একদিকে সরাসরি টাকা দিয়ে, নানা লোভ দেখিয়ে মদ দিয়ে ভোট কেনার 'ম্যাজিক'। সর্বোপরি জাতপাত, সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করে ভোট দখলের ম্যাজিক। আর তার সাথে আছে প্রশাসনের সর্বস্তরে আরএসএসের লোক বসানোর কৌশল। এমন ম্যাজিকের বলেই প্রবল সরকার বিরোধী জনমতের ঠিক বিপরীত চিত্র দেখাল ভোট মেশিন। এবারের বিহার ভোটে রিটার্নিং অফিসারদের ভূমিকা অনেক ক্ষেত্রেই ছিল শাসকদের পক্ষে। এমনকি হিলসা কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসার আরজেডি প্রার্থীকে জয়ী ঘোষণা করেও কিছুক্ষণ পরে ১২ ভোটে বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী বলে দেন। পোস্টাল ব্যালট গণনা নিয়ে প্রায় সমস্ত কেন্দ্রেই অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

পাটনার 'চন্দ্রগুপ্ত প্রবন্ধন সংস্থান' ১১টি জেলার ২৫ আসন ধরে সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে ২০ শতাংশের বেশি ভোটার কোনও না কোনও প্রলোভনে পড়েই ভোট দিয়েছেন। এর মধ্যে আছে মদ থেকে শুরু করে টাকা, এমনকি দু'চারদিনের ভাল ভোজ। আর আছে কিছু সুযোগ-সুবিধার টোপ। দরিদ্র মানুষের অসহায়ত্ব এতটাই যে, এই সামান্য কিছু পেলেই তারা যেন বর্তে যায়। এই পরিস্থিতির সুবিধা নিয়েছে শাসক এনডিএ। কারণ এই মুহূর্তে করপোরেটদের আশীর্বাদের দৌলতে বিজেপির টাকার থলিটাই এখন সবচেয়ে মোটা। মানুষের দারিদ্র আর অসচেতনতার সুযোগ নেওয়ার ক্ষমতা তাই তাদেরই বেশি। ম্যাজিকের মানে যদি ধোঁকাবাজি হয়, তাহলে তা অবশ্যই ছিল।

জাতপাত-ধর্মই কি প্রধান ইস্যু!

যত নির্বাচন কাছে এসেছে সংবাদমাধ্যম থেকে শুরু করে প্রায় প্রতিটি দলেরই ভোট প্রচারের প্রধান হাতিয়ার হয়েছে নানা জাতপাত ধর্মবর্ণ সংক্রান্ত বিভেদ। খোদ নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার বিহারে গেছেন, কিন্তু না কর্মসংস্থানের কথা, না কৃষকদের কথা কিছুই উচ্চারণ করেননি। পরিযায়ী শ্রমিকদের দুর্দশার কথা তো মুখে আনতেই তাঁর বারণ আছে মনে হয়! তিনি জানতেন দেশের মানুষের প্রকৃত সমস্যাগুলি যদি মানুষের মনে প্রধান ইস্যু হয়ে দেখা দেয়, তাহলে বিজেপি তথা তাদের আসল প্রভু পুঁজিপতি শ্রেণির মহা বিপদ। তাই নরেন্দ্র মোদীর প্রচারের মূল বিষয় ছিল মূলত রাম মন্দির নির্মাণ, হিন্দুত্ববাদী আস্ফালন। এরমধ্যেই সুকৌশলে তিনি আরজেডির শাসনকালে যাদবদের প্রাধান্যের ইঙ্গিত দিয়ে বিজেপির প্রধান ভোটব্যাঙ্ক উচ্চবর্ণের সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দিয়েছেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সুকৌশলে মুসলিম সমাজকে এক করে দেখানোর জঘন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁর চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধ নিয়ে উচ্চগ্রামের আস্ফালন শুনে মনে হতে পারে এটাই বোধহয় বিহারের প্রধান সমস্যা। এদিকে বিহারে যেহেতু তথাকথিত নিম্নবর্ণের ভোটের প্রশ্ন অনেকটাই বড়, তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিহারে জনসভায় দাঁড়িয়ে নিজেকে তথাকিথত নিচু জাতের প্রতিনিধি হিসাবে তুলে ধরতে হয়েছে বারবার।

বিজেপি যখন দেখেছে মুসলিমদের বেশিরভাগ মহাজোটের পক্ষে গেলে তাদের সমূহ ক্ষতি, তারা মদত দিয়ে আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল এআইএমআইএম (অল ইন্ডিয়া মজলিস-এ ইত্তেহাদুল মুসলিমিন) কে বেশ কিছু সিটে খাড়া করে দিয়েছে। তারা মুসলিম ধর্মভিত্তিক সাম্প্রদায়িক প্রচার যত করেছে তত বিজেপির সুবিধা হয়েছে হিন্দুত্ববাদী প্রচারকে তুঙ্গে তুলতে। ফলে একদিকে বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ হয়ে গেছে, অন্যদিকে বিজেপি হিন্দুত্ববাদের চাম্পিয়ান হয়ে ভোট কুড়োনোর কাজে খোলা মাঠ পেয়ে গেছে।

বিজেপির জোট সঙ্গী নীতীশ কুমারের জেডিইউ ২০১৫ সালে লালু প্রসাদ যাদবের দল আরজেডি-র সাথে জোট বেঁধে 'পিছড়ে বর্গ' অর্থাৎ পিছিয়ে পড়া জাত সমূহের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে চেয়েছিল। কিন্তু কিছুদিন বাদেই বিজেপি কেন্দ্রীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁর ভোটব্যাঙ্কে ফাটল ধরাচ্ছে দেখে তিনি আবার বিজেপির হাত ধরে ফেলেন। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে নীতীশজি আবার ওবিসিদের মধ্যে অতি পিছড়ে বর্গ এক্সট্রিমলি ব্যাকওয়ার্ড কাস্ট (ইবিসি) ভাগ করে তাদের ত্রাতা বনবার চেষ্টা করতে থাকেন। জেডিইউ মূলত কুর্মি সমাজের ত্রাতা সেজে রাজনীতি করে। তাতে এই অংশের গরিব মানুষের কি কোনও উন্নতি হয়েছে? হওয়া কি সম্ভব? বিহারের ওবিসি, ইবিসিদের লক্ষ লক্ষ মানুষ রাজ্যে কোনও কাজ না পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের দলে নাম লেখাতে বাধ্য হন। আরজেডি মূলত যাদব আর মুসলিমদের ত্রাতা সাজে। তাদের রাজত্বে এদের কী উন্নতি হয়েছে? বহুযুগ ধরে অত্যাচারিত, পদদলিত এই সব মানুষের যন্ত্রণা, দারিদ্রকে হাতিয়ার করে এইসব জাতপাত ভিত্তিক দলের নেতারা আখের গোছান। ৯০-এর দশক থেকে যে উদারিকরণ, বেসরকারিকরণের নীতি সরকারগুলি নিয়ে চলছে, এই দলগুলি কি তার বিরোধিতা কোনওদিন করেছে? নাকি যখনই নানা দলের সরকারে তারা কেন্দ্রীয় ক্ষমতার ভাগ পেয়েছে, এই নীতিগুলিই এগিয়ে নিয়ে গেছে। এ বিষয়ে জেডিইউ-আরজেডি-বিএসপি ইত্যাদি জাতপাত ভিত্তিক দলের কোনও পার্থক্য আছে? এদের নেতারা বিজেপি কিংবা কংগ্রেসের উচ্চবর্ণ ভিত্তিক ভোটব্যাঙ্কের দিকে আঙুল তুলে মনুবাদী রাজনীতির বিরুদ্ধে কথা বলেন। আর ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সুযোগ পেলেই সেই বিজেপি কিংবা কংগ্রেসের সাথেই হাত মেলান। নীতিশ কুমার বিজেপির সাথে আছেন, লালুপ্রসাদ যাদব জুড়েছেন কংগ্রেসের সাথে। দলিত নেত্রী বলে খ্যাত মায়াবতী বিজেপির সাথে মিলে উত্তরপ্রদেশে সরকার চালিয়েছেন, এখন

আটের পাতায় দেখুন

ধর্মঘটে অচল গোটা দেশ

একের পাতার পর

অধিকারগুলি ছিনিয়ে নেবে। বেকার সমস্যা নেবে আরও ভয়ঙ্কর রূপ। চাকরির নিরাপত্তা বলে আর কিছু থাকবে না।

মানুষের মতামতের তোয়াক্কা না করে, সংসদীয় রীতিনীতিকে দু'পায়ে মাড়িয়ে মোদি সরকার পাশ করিয়ে নিয়েছে ভয়ঙ্কর কৃষি আইন। কৃষিক্ষেত্রকে তুলে দিয়েছে কৃষিপণ্যের একচেটিয়া মালিকদের হাতের মুঠোয়। অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের অবাধ মজুতদারির সুযোগ ও যথেচ্ছ দাম বাড়াবার অধিকার দিয়েছে মজুতদার-কালোবাজারিদের।

শ্রম আইনগুলিকে পাল্টে মোদি সরকার অবাধ ছাঁটাইয়ের অধিকার তুলে দিয়েছে মালিকদের হাতে। কাজের সময় আট ঘণ্টার বদলে ১২ ঘণ্টা করতে চলেছে। সরকারি দপ্তরেও তিন মাসের নোটিশে কর্মীদের ছাঁটাই করা যাবে। মালিকদের স্বার্থে যারা এত দ্রুত এই আইনগুলিকে পাস করিয়ে দিল, সেই বিজেপি সরকারই কিন্তু এতগুলি বছরে কোটি কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরিটুকুও নিশ্চিত করেনি। নিশ্চিত করেনি দেশের সমস্ত মানুষের দু'বেলা অন্ন, কিংবা রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার।

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এনে মালিকদের অবাধ মুনাফা লুটের ব্যবস্থা করে দিয়েছে মোদি সরকার। ফলে লেখাপড়া শেখার চড়া দাম মেটাতে না পেরে শিক্ষার আঙিনা থেকে ক্রমে আরও দূরে সরে যাবে গরিব, মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা।

এই সব সর্বনাশা আইন বাতিলে সরকারকে বাধ্য করার একমাত্র রাস্তা ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, লাগাতার গণআন্দোলন। সেই পথেই এসেছে ২৬ নভেম্বরের ধর্মঘট। সর্বশক্তি উজাড় করে ঘাম-ঝরানো শ্রমে উৎপাদনের চাকা ঘুরিয়ে দেশকে সচল রাখেন যাঁরা, এদিন সর্বশক্তি উজাড় করেই তাঁরা স্তব্ধ করে দিয়েছেন সেই চাকা।

এই ধর্মঘট দেখিয়ে দিল, বিজেপি সরকারকে জনবিরোধী নীতি প্রত্যাহারে বাধ্য করতে পারে একমাত্র ঐক্যবদ্ধ বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলন। আরও দেখাল, নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন কোনও বিকল্প নয়। শক্তিশালী গণআন্দোলনই একমাত্র বিকল্প। ধর্মঘটের এই সাফল্যের উপর দাঁড়িয়েই আন্দোলনকে আরও বৃহত্তর রূপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জনগণের শক্তিশালী গণকমিটি আজ জরুরি।

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রবীণ সদস্য, গণদাবী প্রেসের দীর্ঘকালের কর্মী ও সংগঠক কমরেড তিমির সিকদার ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ২০ নভেম্বর ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

ধর্মঘটের দিন বাঙ্গালোর

গুনা, মধ্যপ্রদেশ

বিহার নির্বাচন

সাতের পাতার পর

সিবিআই-এর হাত থেকে বাঁচতে আবার বিজেপির গা ঘেঁষে চলছেন? দরিদ্র, নিপীড়িত মানুষের সমস্যা যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক, সেটাই এরা ভুলিয়ে দিতে চায়। ভোট রাজনীতির স্বার্থে এই জাতপাতের ভাগ গরিব খেটে খাওয়া মানুষের চরম ক্ষতি করছে।

কিছু ভোট বেশি পেলেই বামপন্থার শক্তি বাড়ে না

বিহারে সিপিআই (এমএল) লিবারেশন ১২টি এবং সিপিএম ও সিপিআই ২টি করে আসন পাওয়ার পর এ নিয়ে বেশ অলোচনা হচ্ছে। বুর্জোয়া সংবাদমাধ্যমও এই নেতাদের সাক্ষাৎকার ফলাও করে ছাপছে। তাঁদের সাফল্য এসেছে ভাল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বামপন্থী কর্মী সমর্থকদের কিছু বিষয় ভেবে দেখতে বলব। বিজেপি বিরোধী হিসাবে যে দলগুলিকে তুলে ধরে তাঁরা জোট করলেন, তাদের চরিত্র কী? ২০১৪ থেকে বিজেপি যে কুশাসন চালিয়ে আসছে, তার বিরুদ্ধে এই সমস্ত বুর্জোয়া পেটিবুর্জোয়া দলগুলি কোনও ভূমিকা পালন করেছে, আন্দোলন গড়ে তুলেছে? ২০১৪-র লোকসভা নির্বাচনে হারের পর থেকে কংগ্রেসকে তো দেখাই যাচ্ছে না। ২০১৫ সালে নীতীশ কুমার ছিলেন প্রবল বিজেপি বিরোধী, আজ তিনি বিজেপির শরিক। কাল যদি তিনি আবার তেজস্বী যাদবদের হাত ধরেন, তিনি প্রবল প্রগতিশীল হয়ে যাবেন? এ ভাবে যারা বিজেপির মতো একটা ফ্যাসিস্ট শক্তির মোকাবিলার কথা ভাবে তারা ভোট রাজনীতির খোয়াবেই মশগুল। আরজেডি-র তেজস্বী যাদব, কংগ্রেস ইত্যাদি শক্তির সাথে সিপিআই-সিপিএম-লিবারেশন ইত্যাদিরা যখন 'মহাগোঠ বন্ধন' গড়ে তুলেছেন, তার উদ্দেশ্যের মধ্যে বিজেপির নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কোনও কর্মসূচি আদৌ ছিল না। তাঁরা জাতপাত ভিত্তিক ভোট সমীকরণকেই পাখির চোখ করেছিলেন! এর দ্বারা আর যাই হোক বিজেপির মতো উগ্র দক্ষিণপন্থার শক্তিকে জনমানস থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বামপন্থাও শক্তিশালী হয় না। ফলে কিছু আসনে বামপন্থী দলগুলির জয়কেই যদি কেউ বামপন্থার জয় বলে মনে করেন তাহলে আবার মারাত্মক ভুল করা হবে।

বিহারের মানুষের জীবনের গভীর সমস্যা নিয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা কি এই সব বামপন্থী দল করেছে? নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু মিটিং মিছিল করে লোকের ক্ষোভ জাগানো নয়, জনগণকে জড়িত করে গণকমিটি গড়ে তুলে দীর্ঘস্থায়ী গণআন্দোলনের কোনও উদ্যোগ তাঁরা নেননি। পরিযায়ী শ্রমিকদের যখন বিহার সরকার আটকেছে, তার বিরুদ্ধে কিছু বিবৃতি ছাড়া কোনও আন্দোলন তাঁরা করেননি। এস ইউ সি আই (সি) বামপন্থী দলগুলির কাছে বিহার সহ সারা দেশ জুড়ে যুক্ত আন্দোলনের প্রস্তাব দিয়েছিল। এই দলগুলির নেতারা কেউ কর্ণপাত করেননি। ফলে এস ইউ সি আই (সি)-কে কার্যত একাই আন্দোলন গড়ে তুলতে হয়।

আরজেডি-কংগ্রেস ইত্যাদিরা ভোটের সময় করপোরেট একচেটিয়া মালিকদের বিরুদ্ধে যখন কিছু গরম স্লোগানও দেয়, তা কি আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য? নাকি মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য? একচেটিয়া মালিকদের বিশ্বস্ত দল হিসাবে কংগ্রেসই প্রথম ভারতে ফ্যাসিবাদী শাসন কায়েম করার চেষ্টা করেছে। চিন্তা জগতে ফ্যাসিবাদী সংস্কৃতি তারাই আনতে চেয়েছে। এই কংগ্রেসকে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধ-শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে পারে কোনও বামপন্থী দল? বামপন্থী রাজনীতির মধ্যে তো বামপন্থা থাকবে, ভোট জোগাড়ে যেখানে যাতে সুবিধা তা করলেই বামপন্থার শক্তি বাড়বে? নির্বাচনী সুবিধার নানা খেলার মধ্যেই ঘুরপাক খাবে বামপন্থী রাজনীতি?

সিপিএম সিপিআই সংসদীয় রাজনীতিটাকেই তাদের রাজনীতির একমাত্র লক্ষ্য করে নিয়েছে। ফলে তার জন্য যেখানে যেমন সুবিধা সে পথে হাঁটার লাইনই তাঁরা নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছর ধরে সরকারি ক্ষমতায় থাকার পর আজ দলে দলে সিপিএম কর্মী সমর্থকরা বিজেপিতে লাইন দিচ্ছেন। কেমন বামপন্থা শিখিয়েছেন তাঁরা! কংগ্রেস-বিজেপি একচেটিয়া পুঁজির এই দুই প্রধান সেবাদাস দলের বিরুদ্ধেই এস ইউ সি আই (সি) ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের লাইন তুলে ধরছে। তাই সিপিএম-সিপিআই নেতৃত্ব এই দলকে এড়িয়ে চলছেন।

সিপিআই(এমএল) লিবারেশন নকশালপন্থী রাজনীতির ধারায় চলে। যে ধারা একসময় পার্লামেন্টকে শুয়োরের খোঁয়াড় বলে নির্বাচনই বয়কট করে বসেছিল। বুর্জোয়া সংসদীয় নির্বাচন সম্বন্ধে লেনিনীয় নীতির শিক্ষাকে তারা তখন গুরুত্বই দেয়নি। এখন আবার সংসদীয় নির্বাচনে অংশ নিতে গিয়ে তাঁরা সংসদীয় রাজনীতির পাঁকেই ফেঁসে যাচ্ছেন। তাঁরা বিহারের তথাকথিত নিম্ন বর্ণের মানুষ, দলিত ইত্যাদি অংশের দরিদ্র মানুষের অপরিসীম দুর্দশাকে কেন্দ্র করে থাকা প্রবল বিক্ষোভকে সামনে রেখে কিছু লোক জড়ো করতে পেরেছেন। কিন্তু শত্রু-মিত্রের প্রশ্নটা জাতপাতেই আটকে গেছে। এই নিয়ে কিছু লড়াইও হয়েছে। কিন্তু মূল শত্রু পুঁজিবাদী ব্যবস্থা এবং তার রক্ষক রাজনীতির বিরুদ্ধে মানুষের সচেতনতা গড়ে তোলার কঠোর কঠিন সংগ্রামটা এড়িয়ে গিয়ে গরম গরম কিছু স্লোগান দিলেই যে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে হারানো যায় না, সেই সত্যটা আবার প্রমাণিত হয়েছে। 'কাস্ট ইজ ক্লাস' অর্থাৎ জাতভিত্তিক লড়াইটাই শ্রেণি সংগ্রাম, এই ভ্রান্ত তত্ত্ব দরিদ্র খেটে খাওয়া মানুষের ঐক্যকে দুর্বলই করেছে। 'বিজেপি মূল শত্রু' এই কথাটা তাঁরা এখন বলছেন। কিন্তু তার অর্থ যদি অন্যত্র বিজেপি বিরোধী ভোটের জন্য নতুন কোনও বোঝাপড়া হয়, তা কি বিজেপির রাজনীতিকে মোকাবিলা করার শক্তি জোগাবে? এই সূত্রে তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ বা অন্য কোথাও আরও কিছু আসনের বন্দোবস্ত হয়ত করতেও পারেন, তাতে বামপন্থী আন্দোলনের কোনও লাভ নেই। ঐক্য হবে আন্দোলনের জমিতে দাঁড়িয়ে। গণআন্দোলনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ঐক্য না হলে সে ঐক্য ভোটে যাই ফল দিক, জনগণের কোনও উপকার হয় না।

আজকের পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের এই সার্বিক অবক্ষয়ের দিনে কোনও বামপন্থী কমিউনিস্ট দল নির্বাচনী লড়াইকে কোন দৃষ্টিতে দেখে তা মহান নেতা লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে ভারতের মাটিতে দেখিয়েছিলেন মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ। তিনি দেখিয়েছেন, কোনও যথার্থ সাম্যবাদী দল যখন এই বুর্জোয়া ব্যবস্থার মধ্যে নির্বাচনে লড়ে, তারা এই ব্যবস্থার প্রতি মোহ তৈরি করার জন্য চেষ্টা করে না। বরং গণআন্দোলন বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করা এবং জনগণের মধ্য থেকে এই নির্বাচনের প্রতি মিথ্যা মোহ কাটানোটাই থাকে তার লক্ষ্য। এমনকি যদি তারা সরকারেও চলে যায় সরকারি ক্ষমতার প্রতি মোহ তৈরি নয়, তার সুযোগ নিয়ে আন্দোলনকে শক্তিশালী করাই তাদের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

বিহার নির্বাচনের শিক্ষা দেখিয়ে গেল বামপন্থা-রহিত ভোট-রাজনীতি প্রগতির শক্তিকে বাড়ায় না। বরং তাকে আরও দুর্বল করে। যে দুর্বলতার সুযোগ বিহারে নিয়েছে বিজেপি। এ শিক্ষা ভুলে গেলে সর্বনাশ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মীয় বেদি স্থাপনের প্রতিবাদ

বিক্ষোভে ডিএসও এবং এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ডিঞ্জ বিল্ডিং চত্বরে ধর্মীয়বেদি প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদে ১৩ নভেম্বর কলেজ স্ট্রিটে যৌথ প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হল ছাত্রসংগঠন এআইডিএসও এবং ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়। বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন এআইডিএসও কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আবু সাঈদ এবং কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড শুভেন্দু মুখার্জী। তাঁরা বলেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শতাব্দীপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সহ দেশের মহান ব্যক্তিত্বরা যুক্ত থেকেছেন এবং ধর্মনিরপেক্ষতার চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছেন, সেখানে এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দীর্ঘ ধর্মনিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে কলঙ্কিত করেছে। বেদির বদলে অবিলম্বে মানবতাবাদী মনীষীদের মূর্তি স্থাপন করা হোক এবং মন্দিরটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্যত্র স্থানান্তর করা হোক। বিক্ষোভ মিছিলে আবু সাঈদ বলেন, শতাব্দীপ্রাচীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে কোনও বিশেষ ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বেদি প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই ধরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে নানা ধর্মীয় কার্যকলাপের সূচনা হবে যা কখনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাম্য হতে পারে না। যে কোনও সভ্য ও গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না।

সংগঠন দুটির পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা করে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হয়।

ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদ এটিএম কর্মীদের

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার এটিএম থেকে কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনার প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর সিবিইইউএফ-এর নেতৃত্বে বারুইপুর এসবিআই আরবিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেড নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার, এম খান, মনজুর, গাজী, নীলকমল, প্রশান্ত, বসির প্রমুখ। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেড নারায়ণ চন্দ্র পোদ্দার, মনোজ মণ্ডল, ইউসুফ মোল্লা।

ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল জেলায় জেলায়

কোচবিহার ঃ কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনস্বার্থবিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধে ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে বামপন্থী ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের উদ্যোগে ১৮ নভেম্বর একটি যুক্ত বিক্ষোভ মিছিল হয়। সুসজ্জিত, দৃপ্ত মিছিলে পথসভা হয় ডিএসও, ডিওয়াইও, এমএসএস-এর উদ্যোগে। কেশিয়াড়ী মোড় থেকে শুরু হয়ে মিছিল সারা শহর পরিক্রমা করে। ট্রাফিক স্ট্যান্ডের সামনে পথসভার আয়োজন করা হয়। এনরেগা প্রকল্পে ২০০ দিন কাজ, সমস্ত শ্রমজীবী পরিবারপিছু ৭৫০০ টাকা ভাতা প্রদান, রেশনে ১০ কেজি করে খাদ্যশস্য দেওয়া সহ ৭ দফা দাবিতে এবং রেল, ব্যাংক, বিমা সহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণের প্রতিবাদে বক্তব্য রাখেন বক্তারা। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইও-র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক সুশান্ত পানিগ্রাহী, ডিএসও-র জেলা সম্পাদক ব্রতীন দাস, এমএসএস নেত্রী কণিকা ধাড়া প্রমুখ।

উলুবেড়িয়া, হাওড়া

পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ ধর্মঘটের সমর্থনে ১০ নভেম্বর নারায়ণগড় ব্লকের বেলদাতে মিছিল ও স্লোগান ওঠে, রেল-ব্যাঙ্কসহ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বেসরকারিকরণ চলবে না, সর্বনাশা কৃষি আইন বাতিল করতে হবে, জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করতে হবে ইত্যাদি।

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগণা

হাওড়া শহর

কলকাতা

যথাযোগ্য মর্যাদায় বিরসা মুন্ডার জন্মদিবস পালিত

অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির নেতৃত্বে রাজ্যে রাজ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে আদিবাসী জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম 'উলগুলান'-এর নায়ক বিরসা

বেলদা, পশ্চিম মেদিনীপুর

বিরসা মুন্ডা স্মরণ, ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে

মুন্ডার ১৪৬ তম জন্মদিবস পালিত হল ১৫ নভেম্বর। ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ছাত্র, যুবক, মহিলা ও শ্রমিকরা এদিন এই বীর শহিদের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান।

পশ্চিমবঙ্গে পশ্চিম মেদিনীপুরে কেশিয়াড়ী ব্লকের কানপুরে এদিন বিরসা মুন্ডা স্মৃতি শিক্ষা নিকেতনে বিরসা মুন্ডা ও বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। মাল্যদান করেন বিদ্যালয়ের প্রধান উপদেষ্টা প্রদীপ দাস সহ শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীরা। একটি আলোচনা সভা হয়। বিরসা মুন্ডার জীবনের নানা ঘটনা ও তাঁর জীবনাদর্শের কথা তুলে ধরেন বক্তারা। উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফটিক বেরা সহ আরও অনেকে।

ইসলামপুরে রেশন ডিলারকে ঘেরাও

উত্তর দিনাজপুরে ইসলামপুর শহর সংলগ্ন অলিগঞ্জের ১৫ নং রেশন ডিলার দীর্ঘদিন ধরেই রেশনসামগ্রী নিয়ে দুর্নীতি চালাচ্ছিলেন। গ্রাহকদের প্রাপ্য পরিমাণের অর্ধেকটা দেওয়া, লকডাউনের সময় সরকারের দেওয়া অতিরিক্ত খাদ্যসামগ্রী পুরোটাই আত্মসাৎ করা ইত্যাদি দীর্ঘদিন ধরে চলছিল। গ্রাহকরা বার বার ক্ষোভ প্রকাশ করলেও এই ডিলার তাতে কর্ণপাত করেননি, উল্টে তাঁদের কার্ড ট্রান্সফারের হুমকি দিতেন। শেষপর্যন্ত রেশন গ্রাহকদের আন্দোলনের হাতিয়ার সংগ্রামী গণমঞ্চের অলিগঞ্জ শাখা গঠন করেন গ্রাহকরা। সংগঠনের উদ্যোগে হুমকি উপেক্ষা করে ১০ নভেম্বর সহস্রাধিক রেশন গ্রাহক ওই ডিলারকে চার ঘণ্টা ধরে ঘেরাও করে রাখেন।

আন্দোলনের চাপে ডিলার লিখিতভাবে নিজের অন্যায় স্বীকার করেন এবং জানান, ক্ষতিপূরণ হিসেবে এক বছর ধরে প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫ কিলো অতিরিক্ত চাল দেবেন। এরপর থেকে প্রতি মাসে সরকার নির্ধারিত পরিমাণেই রেশন সামগ্রীও দেবেন।

সংগঠিত আন্দোলনের এই জয়ে এলাকার মানুষ উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন এবং এতদিন ধরে নির্বাক দর্শকের ভূমিকায় থাকা খাদ্যদপ্তর হঠাৎ জেগে উঠে ওই ডিলারকে সাসপেন্ড করে ৫/৬ কিমি দূরে ট্যাগ করেন। কিন্তু এতে গ্রাহকদের হয়রানি বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ক্ষতিপূরণ থেকেও তারা বঞ্চিত হবেন। তাই অলিগঞ্জের গ্রাহকরা গ্রামেই দ্বিতীয় কাউন্টার চালু এবং ক্ষতিপূরণের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছেন। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সুজনকৃষ্ণ পাল, শাহিদ আলম, ইমতিয়াজ আলম, রফিক মহম্মদ প্রমুখ।

কুলতলিতে পরিযায়ী শ্রমিকদের বিক্ষোভ

পরিযায়ী শ্রমিক সমিতি, কুলতলি ব্লক কমিটির উদ্যোগে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলি ব্লক অফিসের সামনে ১৯ নভেম্বর বিক্ষোভ দেখান প্রায় দু'হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। পরিযায়ী শ্রমিকদের নাম সরকারি ভাবে নথিভুক্তিকরণ, বিনামূল্যে খাদ্য, সকল শ্রমিকের কাজ, অন্যথায় মাসিক ৭৫০০ টাকা ভাতা প্রদান, জব কার্ড প্রদান সহ একগুচ্ছ দাবি নিয়ে ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে শ্রমজীবী মানুষ উপস্থিত হয়েছিলেন। মূল আলোচক ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়ন্ত সাহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা ইনচার্জ কমরেড শ্যামল প্রামাণিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। কমরেড অমল সাহুর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ব্লক আধিকারিকের সঙ্গে বিভিন্ন দাবি নিয়ে আলোচনা করেন।

আশা কর্মীদের ডেপুটেশন উলুবেড়িয়া এসডিও-তে

সাম্প্রতিক অতিমারি পরিস্থিতিতে অত্যন্ত ঝুঁকির মধ্যে কাজ করছেন আশা কর্মীরা। অথচ নেই স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি। 'দিশা' ডিউটিতে নেই উপযুক্ত পরিকাঠামো ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা। বহু ক্ষেত্রে মিলছে না প্যাকেজের টাকাও। এইসব সমস্যার সমাধান সহ ন্যূনতম ২১ হাজার টাকা বেতন ও অন্যান্য দাবিতে হাওড়া জেলার আশা কর্মীরা ১৭ নভেম্বর উলুবেড়িয়া এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেন। প্রতিনিধিত্ব করেন মধুমিতা মুখার্জি, শাহানা সুলতানা, মিলি মণ্ডল, তাপসী গিরি প্রমুখ।

এদিন সকালে তাঁরা উলুবেড়িয়া স্টেশনে সমবেত হয়ে ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে উলুবেড়িয়া শহরে সুসজ্জিত মিছিল করেন। এসডিও অফিসের সামনে ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি হাওড়া গ্রামীণ জেলা কমিটির সংগঠক নিখিল বেরা।

বেলদাকে মহকুমা ঘোষণার দাবিতে মিছিল

বেলদা রেলযাত্রী ও নাগরিক কল্যাণ সমিতির নেতৃত্বে বেলদাকে মহকুমা ঘোষণা, কেশিয়াড়ি মোড়ে ওভারব্রিজ, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম ও আরও একজোড়া লোকাল ট্রেন চালুর দাবি সহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের দাবিতে গণঅবস্থান ও মিছিল সংগঠিত হল পশ্চিম মেদিনীপুরের বেলদাতে, ৯ নভেম্বর। মিছিল কেশিয়াড়ী মোড় থেকে শুরু হয়ে বেলদা শহর পরিক্রমা করে। বেলদা শহরের বিভিন্ন দাবি নিয়ে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তাদেওয়া হয়েছে এদিনের অবস্থান কর্মসূচি থেকে। উপস্থিত ছিলেন রামলাল রাঠি, প্রদীপ দাস, তুষার জানা, সুশান্ত পানিগ্রাহী সহ আরও অনেকে।

পাঠকের মতামত

পরিবেশ রক্ষা জরুরি

দীপাবলি হোক শুধুই আলোর। বন্ধ হোক শব্দ দানবের উচ্ছৃখল তাণ্ডব। শুধু হাইকোর্টের রায়কে মান্যতা দেওয়া অথবা করোনা প্রতিরোধের জন্যই নয়, এ হল মানব সমাজের অস্তিত্ব আরও কিছুদিন টিকিয়ে রাখার জন্যই। এক শ্রেণির মানুষের সংকীর্ণ স্বার্থবাহী ভয়ঙ্কর অত্যাচার পৃথিবী হয়তো বেশিদিন সহ্য করবে না। আমরা সেই ভয়াবহ বিপর্যয়ের ইঙ্গিত পেতে শুরু করেছি। মেরুপ্রদেশের বরফ গলে যাওয়া, গ্রিনহাউস গ্যাসের অতিরিক্ত নির্গমন থেকে শুরু করে বিশ্ব উষ্ণায়নের ভয়াবহ পরিণতির দোরগোড়ায় আমরা ইতিমধ্যে উপস্থিত হয়েছি।

পুঁজির লক্ষ্য যেহেতু সর্বোচ্চ মুনাফা, তাই পুঁজিবাদী রাষ্ট্র পরিবেশ দূষণ নিয়ে, তার ফলে প্রাণীদের স্বাস্থ্যসমস্যা নিয়ে, এমনকি জীবজগতের অস্তিত্ব নিয়েও ভাবে না। মানুষের মৃত্যু তাদের ব্যথিত করে না, পৃথিবীর অকাল ধ্বংস তাদের আশঙ্কিত করে না। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক শতাংশ পুঁজিপতিদের স্বার্থ পূরণের জন্য বাকি নিরানব্বই শতাংশ মানুষের জীবনকে পুঁজিবাদ চরম সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই আমি-আপনি যত সচেতনই হই, যত পরিবেশ বান্ধবই হই, পৃথিবীর এই ধ্বংস হয়ত আমরা আটকাতে পারব না। একমাত্র পুঁজিবাদের বিলুপ্তিই পারে এ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে। তাই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র চাই, যেখানে উৎপাদন পরিচালিত হয় মানুষের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। মানুষের সামগ্রিক কল্যাণই সেখানে রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞানের আবিষ্কার সেখানে সত্যিই মানবকল্যাণে নিয়োজিত। পুঁজিবাদ যেখানে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করেছে অতিরিক্ত মুনাফার জন্য, কর্মহীন করেছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে, সমাজতন্ত্রে সেই বিজ্ঞানই হয়ে উঠেছে আধুনিক জীবনে উত্তরণের সোপান। কারণ সমাজতন্ত্রে বিজ্ঞানের অভিমুখ থাকে মানবকল্যাণের দিকে।

কিন্তু এই পরিস্থিতির মধ্যেও আমরা পরিবেশের সুস্থতা রক্ষায় যদি আরও একটু সচেতন হই, বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য সম্পর্কে আরও একটু ওয়াকিবহাল হই, তবে এ পৃথিবী প্রাণ ভরে আরও একটু বেশি শ্বাস নিতে পারে। তাই আবর্জনাগুলো না পুড়িয়ে নির্দিষ্ট গর্তে রেখে তা থেকে জৈব সার পেতে পারি। গ্যারেজগুলোতে টায়ার, প্লাস্টিক পোড়ানো বন্ধ করা যায়। জলের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আমরা বন্ধ করতে পারি। এসব নিয়ে সচেতনতা প্রচারের উদ্যোগ নিতে পারি। তবেই হয়ত কিছুটা হলেও পরিবেশের ধ্বংস বিলম্বিত করতে পারব।

সূর্যকান্ত চক্রবর্তী
তমলুক, পূর্বমেদিনীপুর

অনলাইন শিক্ষা! ৭৭ শতাংশেরই সুযোগ নেই

শিক্ষায় ডিজিটাল বৈষম্যে আরও এক স্বপ্ন দেখা মেধাবী তরুণী আত্মঘাতী হলেন।

হায়দরাবাদের শাদনগরের বাসিন্দা ঐ তরুণী, জি ঐশ্বর্য রেড্ডি, উচ্চমাধ্যমিকে ৯৮.৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে প্রথম হয়েছিলেন। স্বপ্ন পূরণ করতে দিল্লির লেডি শ্রীরাম কলেজে গণিতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন তিনি। পড়ার খরচ জোগাড় করতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দপ্তরের 'ইন্সপায়ার' বৃত্তির যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষের শুরুতে লকডাউনে সেই বৃত্তির টাকা বন্ধ হয়ে যায়।

এদিকে শুরু হয় অনলাইন ক্লাস। প্রথম দিকে মোবাইলে সেই ক্লাস করতে পারলেও গণিত অনার্সের সেই পাঠের জন্য ল্যাপটপ আবশ্যক হয়ে পড়ে। বাবাকে জানিয়েও ছিলেন। কিন্তু লকডাউনে বাবার বাইক-মিস্ত্রির কাজ এবং মায়ের দর্জির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। বোনের পড়া তার আগেই মাঝপথে বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। মায়ের গয়না এবং এক কামরার বসতবাড়িটিও বন্ধক রাখতে হয়েছিল। চুরমার হয়ে যায় ঐশ্বর্যের স্বপ্ন। ২ নভেম্বর তিনি আত্মঘাতী হন। সুইসাইড নোটে তাঁর শেষ আবেদন ছিল, বৃত্তির প্রাপ্য টাকা দিয়ে যেন তাঁর পরিবারকে ঋণমুক্ত করা হয়।

এমনই মর্মান্তিক পরিণতি ঘটছে সারা দেশে আরও অনেক ছাত্রছাত্রীর। তার কিছু খবরে এসেছে, অনেকেই আসেনি। দেশে অনলাইন পড়াশোনা চালু হয়েছে। কিন্তু ক'জনের আছে এই সঙ্গতি? ভারতে মাত্র ১৫ শতাংশ ছাত্রছাত্রীর স্মার্টফোন এবং ৮ শতাংশের ল্যাপটপ আছে। ভারতের ৫৫ হাজার গ্রামেই নেই ইন্টারনেটের সংযোগ। ২৮ শতাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎও নেই। ফলে খুবই স্বল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী অনলাইন পাঠের আওতায়। ফলে, ঐশ্বর্যের মতো বহু মেধাবী অথচ আর্থিকভাবে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রছাত্রী শিক্ষাবঞ্চিত হল। বৈষম্যমূলক অনলাইন শিক্ষার প্রথম বলি কেরলের মল্লপুরমের দশম শ্রেণির ছাত্রী দেবিকা বালকৃষ্ণান। ১ জুন তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় ১০ জন ছাত্রছাত্রী এবং এক দিনমজুর অভিভাবক এই ডিজিটাল বৈষম্যে আত্মঘাতী হয়েছেন।

শুরু থেকেই সরকার সঠিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গিতে করোনা পরিস্থিতির মোকাবিলায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সাধারণ মানুষের বাস্তব অবস্থায় নজর না দিয়ে অবিবেচক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে মানুষের দৈনন্দিন জীবনকে দুর্বিষহ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। ঐশ্বর্যের পরিবার তারই শিকার হল। এভাবে অনলাইন শিক্ষাব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তে শিক্ষায় সার্বজনীনতাকে ধ্বংস করা হল। শিক্ষায় ডিজিটাল বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠিত করা হল।

শুধু করোনা পরিস্থিতির জন্য নয়, লকডাউন ঘোষণার অনেক আগেই অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে ১০০টা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়কে এ দেশের শিক্ষাবাজারে অনলাইন ডিগ্রি প্রদানের সুযোগ করে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। সরকারের বক্তব্য, উচ্চশিক্ষার হার (গ্রস এনরোলমেন্ট রেশিও) অর্থাৎ ১৮ থেকে ২৩ বছরের তরুণদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর শতকরা হার, যা বর্তমানে ২৬.৩ শতাংশ, তাকে চীনের সমান (৩৫ শতাংশ) করতে সরকার উদ্যোগী। কীভাবে তা করবে? এ দায়িত্ব সরকার নিজে পালন করবে না। বিদেশি কর্পোরেটদের হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিয়েছে সরকার। তারা কি এ দায়িত্ব বিনা পয়সায় করবে? এর আর্থিক দায়ভার ছাত্রছাত্রীকেই বহন করতে হবে। তাছাড়া আরও প্রশ্ন হল, অনলাইন শিক্ষা কি যথার্থই প্রথাগত ক্লাসরুম শিক্ষার বিকল্প হতে পারে? না, হতে পারে না। ক্লাসরুমে ছাত্র-শিক্ষকের পারস্পরিক প্রশ্নোত্তরের পরিবেশে যে শিক্ষা অর্জিত হয়, তা যন্ত্রের পাশে বসে শিক্ষার্থীর আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আসলে শিক্ষা তো শুধু কিছু ফর্মুলা শেখা বা প্রবলেম-সলভ করা নয়। এগুলির পাশাপাশি কিছু মানবিক শিক্ষা ছাত্রছাত্রীরা পায় শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছ থেকে, যা তাদের বড় হওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তা কি কোনও স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ দিতে পারে! এখানেই প্রথাগত শিক্ষার গুরুত্ব। অথচ সরকার প্রথাগত শিক্ষাক্ষেত্রটিকে নানা অজুহাতে সঙ্কুচিত করে চলেছে। তাতে সরকারের শিক্ষার ব্যয়ভার কমবে। নতুন স্কুল-কলেজ খুলতে হবে না। শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে না। বিপরীতে শিক্ষার বেসরকারিকরণকে আরও প্রসারিত করা সম্ভব হবে। এর ফলে গণতান্ত্রিক শিক্ষার টিকে-থাকা পরিসরটুকু থেকে হারিয়ে যাবে ঐশ্বর্য, দেবিকার মতো আরও অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী। তাতে পুঁজিবাদী সরকারের কী আসে যায়! পুঁজিপতি ও তার সেবাদাস সরকারের কাছে মানবসম্পদ নিছকই শোষণের কাঁচামাল।

গরিবদের জন্য নেই
মদ ব্যারনদের চাল দিচ্ছে বিজেপি সরকার

ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার (এফসিআই) গুদামে চাল-ডাল-গম উপচে পড়ছে। কিন্তু এই খবরে দেশবাসীর উৎফুল্ল হওয়ার কোনও কারণ নেই। করোনা অতিমারিতে ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় রুজি-রোজগার হারানো কোটি কোটি মানুষের মুখে এই খবর কোনও হাসি ফোটাতে পারেনি। কারণ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ঘোষণা করেছে, এই উপচে পড়া খাদ্যশস্য তারা অর্ধাহারে-অনাহারে থাকা মানুষের হাতে নয়, তুলে দিচ্ছে মদ (ইথানল) প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির হাতে। শুধু তাই নয়, এই মদ ব্যারনরা যাতে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করতে পারে তার জন্য চালের সাথে সাড়ে ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণও মঞ্জুর করেছে খাদ্য মন্ত্রক। আজ মদ কারবারিদের সাথে সরকারের বোঝাপড়া চলছে প্রকাশ্যেই। একে অপরকে দেখার অলিখিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মদ কারবারিরা শাসক দলকে টাকা জোগায় আর বিনিময়ে শাসক দল তাদের নানা সুবিধা পাইয়ে দেয়। এবার ভুখা জনতার মুখের গ্রাসই বিজেপি সরকার তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এতে মদ কোম্পানিগুলি আর বিজেপি নেতাদের পেট মোটা হলেও দেশের ভুখা জনতাকে খালি পেটেই দিন কাটাতে হবে।

এফসিআই ও রাজ্যের সংস্থাগুলির গুদামে ৭৫২ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত রাখার ক্ষমতা রয়েছে। বাফার স্টক (আপৎকালীন ব্যবস্থা) হিসাবে সরকারের কাছে ৩০৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রাখার কথা। কিন্তু ১ অক্টোবরের হিসেবে গুদামগুলিতে প্রায় ৬৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য রয়েছে। তার উপর কৃষি মন্ত্রকের নির্দেশে খরিফ মরসুমে (আগস্ট-নভেম্বর) ধান কেনা চলছে। সেটাও সব রাজ্যে নয়, যে সমস্ত রাজ্যে (যেমন, পাঞ্জাব) কৃষকরা কেন্দ্রীয় কৃষি আইনের বিরোধিতায় লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে কিছু ধান সরকার কিনেছে। কিন্তু আগামী মাসগুলিতে রেশনে বরাদ্দ চাল-গম দেওয়ার কোনও ঘোষণা সরকার করেনি। নভেম্বর মাসেই মাথাপিছু ৫ কেজি চাল ও ১ কেজি ডাল দেওয়ার মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে রেশনে চাল না দিয়ে মদ (ইথানল) প্রস্তুতকারী সংস্থার হাতে তা তুলে দেওয়ার জন্য সরকার এফসিআইকে বলেছে।

ক্ষুধা সূচকে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের জায়গা হয়েছে ৯৪। এই অবস্থায় ক্ষুধামুক্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল বিনা পয়সায় ওই খাদ্য জনগণকে দেওয়া। কিন্তু সরকার তেল আমদানির খরচ কমানোর অজুহাত তুলে ইথানল তৈরি করতে চাল ব্যবহার করতে চলেছে। এমন কাজ বিজেপির মতো চরম জনস্বার্থ বিরোধী একটি সরকারই করতে পারে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম এখন তলানিতে। তা ছাড়া আম্বানিদের মতো বড় বড় তেল কোম্পানিগুলি তেলক্ষেত্র থেকে অস্বাভাবিক হারে মুনাফা করে চলেছে। সরকার চাইলে অনায়াসে সেই মুনাফা খানিকটা ছাঁটাই করতে পারত। তা না করে গরিবের খাদ্য কেড়ে নেওয়াটাকেই তারা সহজ ব্যবস্থা হিসেবে মনে করল।

করোনা অতিমারিতে যখন রুটি-রুজি হারানো অনাহারী মানুষগুলির কাছে আরও বেশি করে খাদ্যদ্রব্য পৌঁছনোই সরকারের প্রধান কর্তব্য ছিল তখন মদ প্রস্তুতকারী সংস্থার কাছে চাল বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত তাদের চরম জনবিরোধী চরিত্রকেই প্রকট করল। সাথে এটাও পরিষ্কার হল, পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় ক্ষমতাশালী দলগুলি মালিক শ্রেণিরই স্বার্থ দেখে, সাধারণ মানুষের স্বার্থ তাদের কাছে নিতান্তই ফেলনা।

আইন না থাকাই কি সমস্যা সমাধানের পথে বাধা

রাজধানী দিল্লিতে বায়ুদূষণ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। এমনিতেই দিল্লিতে দূষণের মাত্রা বেশি। শীতের আগমনে তা আরও বেড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার তড়িঘড়ি ঘোষণা করেছে এবং সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছে, তারা এ সংক্রান্ত নতুন আইনের ব্যবস্থা করবে। এতে প্রশ্ন উঠেছে, তা হলে কি আইন ছিল না বলেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি? কিন্তু আইন তো ছিল। ১৯৮৬ সালের পরিবেশ আইনে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ধারা রয়েছে। ১৯৮১ সালের আইন রয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাতে ক্ষমতা রয়েছে এই আইনের বলে দূষণকারীদের শাস্তি দেওয়ার। তা হলে নতুন করে আইন আনতে হচ্ছে কেন?

আইন কী করতে পারে? কোনও সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করলে আইন প্রয়োগ করে কিছুটা হলেও তা নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। যদিও এই শ্রেণিবিভক্ত পুঁজিবাদী সমাজে শাসকের করা আইন চালু হলে তা সবসময়ই শোষিত, নির্যাতিত শ্রেণির পক্ষে কাজ করবে এমন নয়। তবে সমাজ পরিচালনা করতে সমস্ত সমাজেই কিছু আইন-কানুন, নীতির প্রয়োজন হয়। সরকারে ক্ষমতাসীন দল আইনের যথাযথ প্রয়োগ করতে পারে, যদি দেশের মানুষের প্রতি তাদের দরদবোধ থাকে, জনস্বার্থে তারা আন্তরিক ভাবে কিছু করতে চায়। কিন্তু শাসক দলগুলি বহু সময়েই সমস্যা থেকে দায়মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে চটজলদি কিছু আইন আনে। ভাল ভাল কথায় ভরা বেশিরভাগ আইন সাধারণ মানুষের কোনও উপকারে লাগে না। দেখা গেছে, কোনও সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হলে বা সমালোচিত হলে কিংবা জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে সরকার তড়িঘড়ি একটা আইন করেই দায় ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে।

২০১২ সালে দিল্লিতে নির্ভয়া ধর্ষণের নৃশংস ঘটনায় দেশজুড়ে যখন প্রবল আন্দোলনে ফেটে পড়েছে মানুষ। সরকার পুলিশ নামিয়ে, জলকামান চালিয়েও প্রতিহত করতে পারেনি রাজধানীর বিক্ষোভ। তা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সর্বত্র, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতায় ছিছি পড়ে গেছে। সেরকম একটা সময়ে সরকার নিয়ে এল নির্ভয়া আইন। ভাবটা এমন যে, এরপর কোনও মহিলার উপর অত্যাচার হলে এই আইনের প্রয়োগ হবে তৎক্ষণাৎ! বাস্তব কী বলছে? প্রয়োগ হচ্ছে কি এই আইনের? শাস্তি হচ্ছে কি নির্যাতনকারীদের? অতি বড় বিজেপি নেতাও হ্যাঁ বলতে পারবেন না। একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। ভারত বিশ্বের মধ্যে নারী নির্যাতন-ধর্ষণের তালিকার শীর্ষে। শিশু থেকে বৃদ্ধা— পাশবিক লালসার শিকার সকলেই। প্রতি ১৫ মিনিটে একজন করে মহিলা ধর্ষিতা হচ্ছেন। প্রতিদিন ৮৮ জন মহিলা পাশবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে দুষ্কৃতীদের শাস্তি দেওয়া দূরের কথা, বহু ক্ষেত্রেই দুষ্কৃতীদের পক্ষ নিচ্ছে সরকার, বহু জায়গায় তাদের অপরাধকে ধামাচাপা দিচ্ছে নির্লজ্জ কদর্যতায়। আর শাসক দলের নেতা-পুলিশ-দুষ্কৃতীদের ভয়ে নির্যাতিতের পরিবারকে এলাকাছাড়া হতে হচ্ছে প্রাণভয়ে।

এর আগেও দেশের মানুষ বহু আইন প্রচলন হতে দেখেছে, মানুষের বহু অধিকারের প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে। কিন্তু তা কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। কংগ্রেস সরকারের আমলে বহু বিজ্ঞাপনের জৌলুসে আনা হয়েছিল খাদ্যের অধিকার আইন, শিক্ষার অধিকার আইন। তার দ্বারা সাধারণ মানুষের কাছে খাদ্যের সুযোগ পৌঁছেছে নাকি? শিক্ষার অধিকার সকলে, অন্তত বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী পেয়েছে নাকি? টন টন খাদ্যশস্য পচে নষ্ট হচ্ছে সরকারি গুদামে। সরকার মদ কোম্পানিগুলিকে সেই চাল দিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু গরিব মানুষ অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। দুবেলা দুমুঠো খাবারের জোগাড়ের জন্য প্রাণপাত করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। পরিবারের সকলে মিলে কাজের চেষ্টা করেও সংসার চালাতে পারছেন না অসংখ্য মানুষ। অপুষ্টি অনাহারে বহু শিশুর মৃত্যু হচ্ছে, খাদ্যের অভাবে রোগের প্রকোপে অকালে ঝরে যাচ্ছে অসংখ্য জীবন। বিশ্ব ব্যাঙ্কের রিপোর্ট বলছে, ২০২১ সালের শুরুতে অন্তত ১৫ কোটি মানুষ চরম দারিদ্রের মধ্যে পড়বেন।

শিক্ষাক্ষেত্রের অবস্থাও ভয়াবহ। শিক্ষার বেসরকারিকরণের নীতির পরিণামে ক্রমশ বেশি সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিক্ষাঙ্গনের বাইরে চলে যাচ্ছে প্রতি বছর। 'অধিকার' কথাটি আইনের বইয়েই শোভা পাচ্ছে। শিক্ষার খরচ জোগাতে না পারায় সন্তানের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন বহু অভিভাবক। প্রায় দিনই সংবাদমাধ্যমে দেখা যায়, বিপুল সংখ্যক ছাত্র ফি দিতে না পারায় পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে। এনএসও রিপোর্টে জানা গেছে, স্কুল বা কলেজে ভর্তি হওয়া প্রতি আট জন ছাত্রের মধ্যে একজন মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং মোট ড্রপআউটের ৬২ শতাংশই হয় স্কুলশিক্ষায়।

তা হলে শুধু আইন করে দিলেই কি মানুষ সমস্যামুক্ত হয়? আইন তৈরি করে যে সরকার, তারা কি সত্যিই চায় আইনের সুযোগগুলি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে? এর জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি যে দরদবোধ থাকা দরকার তা কি তাদের রয়েছে! তা থাকলে এই আইনের প্রয়োগ ঘটিয়ে এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও বহু সমস্যার সমাধান সম্ভব। কিন্তু ক্ষমতা দখল এবং তা ভোগ করাই যাদের একমাত্র লক্ষ্য, তাদের সে সব বালাই নেই। সে কারণে তারা মানুষকে দেখে ভোটের বোড়ে হিসাবে। তাদের কাছে সাধারণ মানুষ এক একটা সংখ্যা মাত্র। শাসক-শাসিতে বিভক্ত সমাজে শাসকের রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলি দেশ-কাল ভেদে সর্বত্র এই ভূমিকাই পালন করে চলেছে।

ফলে গালভরা নানা নামের আড়ালে আইনগুলো হয়ে দাঁড়িয়েছে সরকারের ব্যর্থতার রক্ষাকবচ। তাই আইনের প্রয়োগ ঘটাতে প্রয়োজন জীবনের সমস্যাগুলি নিয়ে জনগণের নেতৃত্বে দুর্বার আন্দোলন। একমাত্র আন্দোলনের চাপে ফেলেই শাসক দলকে আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য করা সম্ভব।

ছাত্র আন্দোলনের জয়

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজগুলির চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা পাশ করে যাওয়ার পরেও কোনও এক বছরে কোনও এক বিষয়ে সাপ্লিমেন্টারি বা ব্যাকলগ থাকার কারণে স্নাতকোত্তরে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছিলেন। ইউজিসির সর্বশেষ নির্দেশিকায় যেখানে সমস্ত সাপ্লিমেন্টারি এবং ব্যাকলগ পরীক্ষা নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় ভর্তির কথা বলা হয়েছিল, সেখানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব থেকে প্রায় ৩০ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত হয়ে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিটি নামে ফোরাম গঠন করে আন্দোলন শুরু করে। অনলাইন এবং অফলাইনে ধারাবাহিক আন্দোলনের চাপে ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি মেনে নিয়ে কর্তৃপক্ষ সমস্ত সাপ্লিমেন্টারি এবং ব্যাকলগ পরীক্ষা নেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছেন। যে দাবিগুলোর ভিত্তিতে আন্দোলন চলছিল, তার অন্যতম একটি দাবি ছিল স্নাতকোত্তরে ভর্তির ব্যবস্থা। সেই দাবিতেও ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস ইউনিটি আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। যতদিন না দাবি পূরণ হয়, ততদিন আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন ফোরামের সদস্যরা।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য, জৌনপুর জেলা কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা ১৭ নভেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। শ্বাসকষ্টের সমস্যার কারণে জৌনপুর হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছিল।

তাঁর মৃত্যুসংবাদে পার্টির নেতা-কর্মী ও জনগণের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। তাঁকে শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে জৌনপুর শহরে তাঁর বাসস্থানে নেতা-কর্মী সহ বহু মানুষ উপস্থিত হন। কমরেড আস্থানা পেশায় আইনজীবী ছিলেন। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে তাঁর কর্মস্থল জৌনপুর জেলা কোর্টের কাজ স্থগিত হয়ে যায়।

যৌবনে দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক প্রয়াত কমরেড ভি এন সিংয়ের সঙ্গে কমরেড আস্থানার যোগাযোগ হয়। সে সময় দলের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষের অনুপ্রেরণায় কমরেড সিং উত্তরপ্রদেশে দলের সংগঠন গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে জৌনপুরে একটি রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়, বক্তা ছিলেন মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ। কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা সেই ক্লাসে যোগ দেন। কমরেড ঘোষের সেই আলোচনা তাঁর মনে গভীর রেখাপাত করে। উত্তরপ্রদেশে দলের সংগঠন গড়ে তোলার শুরুর দিনগুলিতে যে মুষ্টিমেয় সাথীদের নিয়ে কমরেড ভি এন সিং সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, সেই প্রচেষ্টায় যুক্ত হন কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা।

পরবর্তীকালে জৌনপুরে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলতে কমরেড আস্থানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পরে তিনি জেলা সম্পাদকের গুরুদায়িত্বও পালন করেন। সুদীর্ঘ সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তিনি উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি বার্ধক্যজনিত কারণে সক্রিয়ভাবে দলের কাজ করতে না পারলেও পার্টিকে আরও বিকশিত করার কথা তিনি সব সময়েই ভাবতেন এবং বর্তমান জেলা নেতৃত্ব ও কর্মীদের অনুপ্রাণিত করতেন। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হল, জনগণ হারাল একজন সংগ্রামী নেতাকে।

কমরেড জগদীশচন্দ্র আস্থানা লাল সেলাম

দলের কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির কর্মী কমরেড নেপাল মণ্ডল ৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। '৭০-এর দশকে কমরেড নেপাল মণ্ডল সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যুক্ত হন এবং এআইকেকেএমএস সংগঠনের নেতৃত্বে এলাকার গরিব চাষি-বর্গাদার-খেতমজুরদের বিভিন্ন আন্দোলন সংগঠিত করতে অগ্রণী ভূমিকা নেন। নিজ এলাকায় রাস্তা সম্প্রসারণ, হাসপাতাল নির্মাণ, বিদ্যালয় স্থাপন, রেলস্টেশনের দাবিতে বিভিন্ন সময়ে নাগরিক কমিটি গঠন করে যেসব আন্দোলন হয়েছে তাতে তিনি সব সময় নিজে যেমন যুক্ত থেকেছেন এলাকার ভুক্তভোগী নাগরিকদেরও যুক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। ব্যক্তিগত পারিবারিক কর্মসূচি অপেক্ষা দলীয় কর্মসূচিকে তিনি সব সময় প্রাধান্য দিতেন। সদা হাস্যময় প্রফুল্লচিত্ত এই কমরেড সাধারণ মানুষের একান্ত আপনজন ছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদ দলীয় দপ্তরে পৌঁছানোমাত্র হলদিবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রুহল আমিন ও জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য কমরেড হরিভক্ত সর্দার, দলের কর্মীরা সহ এলাকার অসংখ্য মানুষ প্রয়াত কমরেডের মরদেহে পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। কমরেড নেপাল মণ্ডলের আকস্মিক মৃত্যুতে দল একজন সৎ নিষ্ঠাবান কর্মীকে হারাল। ১৭ নভেম্বর উত্তর বড় হলদিবাড়ি এলাকায় প্রয়াত কমরেডের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন কমরেড রুহল আমিন এবং কমরেড হরিভক্ত সর্দার সহ এলাকার বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

কমরেড নেপাল মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের সমর্থনে প্রচার

ভিওয়ানি, হরিয়ানা

আগরতলা, ত্রিপুরা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানাল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন, তমলুকের বহিচাড় গ্রামে। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের তমলুক শাখার সভানেত্রী চন্দনা জানা, সম্পাদিকা প্রতিমা জানা মান্না প্রমুখ।

মাথাভাঙা ২ নং ব্লকের পাটাকামারিতে কৃষক বিরোধী কালা কৃষি আইনের বিরুদ্ধে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ৯ নভেম্বর। কনভেনশন থেকে নাগরিক প্রতিরোধ মঞ্চ গঠন করা হয়।

ধর্মঘটের সমর্থনে অ্যাবেকা

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বণ্টন এবং কয়লা, রেল সহ সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বেসরকারিকরণ করার প্রতিবাদে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমারস অ্যাসোসিয়েশন (অ্যাবেকা) ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটকে সমর্থন জানায়। ধর্মঘটের সমর্থনে পশ্চিম মেদিনীপুরে সভা।

ধর্মঘটের সমর্থনে সরব স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন

এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের আশা, আইসিডিএস, মিড-ডে মিল, পৌর স্বাস্থ্যকর্মীদের উদ্যোগে ২৬ নভেম্বরের সারা ভারত ধর্মঘটের সমর্থনে ১৮ নভেম্বর হাওড়ায় উলুবেড়িয়ার ভক্তা মোড়ে পথসভা হয়। স্কিম ওয়ার্কার্সদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি, পেনশন চালু সহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন আইসিডিএস কর্মী সরস্বতী ভৌমিক ও চন্দনা সামন্ত, মিড-ডে মিল কর্মী মমতা মণ্ডল, অশোকা ধোলে, দুর্গা দেশমুখ ও রুনু সিং। শেষে ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র হাওড়া জেলা সংগঠক নিখিল বেরা।

ফি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রবিক্ষোভ

হরিয়ানায় মেডিকেল কলেজগুলিতে ব্যাপক ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে বিক্ষোভ এআইডিএসও-র

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরে পঞ্চায়েত কর্মচারীদের গণ ই-মেইল

একশো দিনের কাজ, কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, সমব্যথী ইত্যাদি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলি নিরলস পরিশ্রম ও পরিষেবা দিয়ে রাজ্যের গ্রামীণ সাধারণ মানুষের কাছে সফল ভাবে পৌঁছে দেন ত্রিস্তরের পঞ্চায়েত কর্মচারীরা। কাজের সফলতা সত্ত্বেও এই কর্মচারীরা আজও বহু অপ্রাপ্তির শিকার। তাঁদের কাজের কোনও সময়সীমা নেই, তাঁরা সরকারের কোনও স্বাস্থ্যবিমার অন্তর্ভুক্ত নন, পদ অনুযায়ী তাঁদের কাজের কোনও বিভাজন নেই, বদলির কোনও সুষ্ঠু নীতি নেই, নিজস্ব পরিচয়পত্র পর্যন্ত নেই। এমনকি কর্মক্ষেত্রে প্রাপ্য সম্মানটুকুও অনেক সময় তাঁরা পান না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁরা নিজেদের দাবিতে ২-৬ নভেম্বর পঞ্চায়েত সচিব ও পঞ্চায়েত মন্ত্রীর কাছে গণ ই-মেইল পাঠানোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। পাঠানো হয়েছে এক হাজার ই-মেইল। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শুভাশীষ দাস পঞ্চায়েত কর্মচারীদের অভিনন্দন জানিয়ে দাবি আদায়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com